Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
কারবালার ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি যোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কে. এন. তিথি
ব্যাচঃ ২২৭
রোলঃ ২২৭০২১৩৪৫

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
কারবালার ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি যোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কে. এন. তিথি
ব্যাচঃ ২২৭
রোলঃ ২২৭০২১৩৪৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “কারবালার ইতিহাস” বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধায়নে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কে. এন. তিথি, আইডিঃ ২২৭০২১৩৪৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ
মুফতি যোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মওলানা জিল্লুর রহমাহ সাহেব
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "কারবালার ইতিহাস" শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের "মুফতি যোবায়ের হাসান" উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্বাবধায়নে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমারজানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর,২০২৪

(স্বাক্ষর)

কে. এন. তিথি

ব্যাচঃ২২৭

আইডিঃ২২৭০২১৩৪৫
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সূচি	পৃষ্ঠা নং
সূচনা	০৬
শাসনব্যবস্থায় পটপরিবর্তনের আভাস	০৬
ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা.) এর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ	০৭
হযরত হুসাইন (রা.) যে কারণে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি	০৭
ইয়াজিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুল	০৮
ওয়ালিদ ইবনে উতবার নিকট ইয়াজিদের প্রতিনিধি প্রেরণ	০৮
হযরত হুসাইন (রা.) এর মক্কার পথে যাত্রা	০৮
কুফাবাসীদের হযরত হুসাইন (রা.) এর কাছে চিঠি	০৯
মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) এর কুফায় গমন	১০
কুফার গভর্নর পরিবর্তন	১০
মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) এর শাহাদাত	১০
হুসাইন (রা.) এর কুফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং বড় বড় সাহাবীদের নিষেধ	১১
হযরত হুসাইন (রা.) এর সিদ্ধান্তে অটল থাকার কারণ	১১
ইয়াযিদের কাছে হুসাইন (রা.) এর রওনার সংবাদ ও মারওয়ানের পত্র	১১
উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে ইয়াযিদের চিঠি	১২
কুফার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে হুসাইন (রা.) কে বেখবর রাখার অপচেষ্টা	১৩
মুসলিম বিন আকীলের হত্যার সংবাদ	১৩
হুর বিন ইয়াযিদের পরামর্শ	১৫
ইবনে যিয়াদের চাওয়া	১৬
উমর বিন সা'দের কারবালা রওনা	১৭
কারবালার প্রান্তর	১৮
কারবালার যুদ্ধ কি ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ?	২০

কারবালার যুদ্ধ	২০
হুসাইন (রা.) এর ছেলে আব্দুল্লাহ এর শাহাদাত	২২
চিঠি পাঠানো শিয়া কুফীদের গাদ্দারী	২২
হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদাত	২৪
কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন যারা	২৫

কারবালার ইতিহাস

সুচনাঃ

কারবালার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে একটি কালো অন্ধাকরময় একটি অধ্যায়। ইরাকের ফোরাত নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত কারবালা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। এই জনপদ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদরের নাতি এবং জান্নাতের সর্দার হযরত ফাতেমা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর ছোট ছেলে হযরত হুসাইন (রা.) এর করুণভাবে শাহাদাত বরণ এর মাধ্যমে। ইতিহাসে এটা কারবালার যুদ্ধ নামে পরিচিত।

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) সত্য ন্যায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন কোনো কোরবানিই বৃথা যায় না।

মুহাম্মাদ আলী জাওহার তো যথার্থই বলেছেন-
رنگ لاتی ہے حنا پس جانے کے بعد - اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

অর্থ : পিষ্ট হওয়ার পরই মেহেদী রং ধারণ করে/ইসলাম জীবিত হয় প্রতি কারবালার পরে।

এই কারবালার যুদ্ধে হযরত হুসাইন (রা.) সহ আরো অনেক মুসলমানরা শহীদ হন।সেই সাথে অনেক শিশুরাও শহীদ হন। এখানে আমরা কারবালার ঘটনা সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত জানবো ইন শা আল্লাহ।

শাসনব্যবস্থায় পটপরিবর্তনের আভাসঃ

আখেরি নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় মুসলিম শাসনের প্রাণকেন্দ্র ছিল মদিনা মুনাওয়ারা। নবীজি (সা.)-এর ওফাতের পর প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) প্রায় আড়াই বছর খেলাফত পরিচালনা করে ইন্তেকাল করেন। এরপর দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক (রা.) ১০ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে শহীদ হন। তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান গনি (রা.) ১২ বছর খেলাফত পরিচালনা করে শাহাদাতবরণ করেন। এ সময় পর্যন্ত ইসলামি খেলাফতের রাজধানী ছিল মদিনা। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.) দুই বছরের শাসনামলে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হলে প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনায় তিনি খেলাফতের রাজধানী ইরাকের কুফায় স্থানান্তর করেন। এ সময় কুফা ছিল একটি প্রদেশ এবং কুফার গভর্নর ছিলেন উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ। তারই নেতৃত্বে কারবালার নির্মম ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো।

আলী (রা.) এরপর মুসলিম উম্মাহ হাসান ইবনে আলী রা. -এর হাতে খেলাফতের বাই'আত প্রদান করেছিলেন। ৬ মাস দায়িত্ব পালন করার পর উম্মতের মধ্যকার কলহ নিরসনার্থে হাসান রা. আমিরে শাম মুআবিয়া রা. -এর হাতে উম্মতের শাসনভার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এরপর বনু উমাইয়ার রাজতন্ত্র শুরু হয় মুআবিয়া রা. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে।

মুআবিয়া (রা.) সাহাবি ছিলেন। তাঁর ঈমান, আমল, দীনদারী নিয়ে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ইমাম আসকালানী (ফাতহুল বারী, তাফসীর অধ্যায়) ও ইমাম ইবনে কাসির (তাফসীর ইবনে কাসির, সুরা আহকাফ, আয়াত ১৭) বলেছেন, মুআবিয়া রা. তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী শাসক মনোনিত করতে চাইলেন। এ মর্মে তিনি হিজাযের গভর্নর মারওয়ানের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। মারওয়ান লোকদেরকে ডেকে শুনিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ আমিরুল মু'মিনীনকে (মুআবিয়া) ইয়াযিদের মধ্যে কল্যাণ দেখিয়েছেন (অর্থাৎ তিনি ইয়াযিদকে ভালো মনে করছেন)।

ইয়াযিদের মনোনয়ন বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহ'র পছন্দে হয়নি, ন্যূনতম একটি কমিটিও গঠন করা হয়নি। কেবল দু'একজনের পছন্দের ভিত্তিতে মুআবিয়া রা. নিজের জীবদ্দশায় পুত্রের নাম ঘোষণা করে প্রাদেশিক গভর্নরদের মাধ্যমে ইয়াযিদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করিয়েছেন, যদিও তখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবি জীবিত ছিলেন। এ ধরণের এককেন্দ্রিক মনোনয়ন ও জোরপূর্বক বাই'আত গ্রহণ করা খেলাফতের সুন্নাতের বিপরীত। উম্মতের দুনিয়াবি বিষয়াদি পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদন করাই পবিত্র কুরআনের নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"তারা পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে। [সুরা শুরা: ৩৮]

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা.) এর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণঃ

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মৃত্যুর সময় তার পুত্র ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার বয়স ছিলো ৩৪ বছর। সে সময় তিনি ছিলেন হিমস এর উপকন্ঠবর্তি হাওয়ারিন দুর্গে। পিতার মৃত্যুর দুঃসংবাদ শোনার পর তিনি খেলাফতের রাজধানীর দিকে রওনা দেন। তার পৌঁছানোর পূর্বেই পিতার দাফন কাফন শেষ হয়ে যায়।

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব পান।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শেষ জীবনে হযরত নোমান বিন বশির (রা.) ছিলেন কুফার গভর্নর, বসরার গভর্নর ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জিয়াদ, মদিনার গভর্নর ছিলেন ওয়ালিদ বিন উকবা। ইয়াজিদ তাদের আপন দায়িত্বে বহাল রাখল। ইয়াজিদ খিলাফতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে গ্রহণ করার পর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মৃত্যুর সংবাদ সবাইকে জানিয়ে দিলেন এবং তার নিকট বাইয়াত গ্রহণের জন্য প্রতিনিধিদেরকে তার নিকট যাত্রা করার আদেশ দিলেন।

হযরত হুসাইন (রা.) যে কারণে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননিঃ

মুয়াবিয়া (রা.) শাসনামলে হুসাইন (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) র অবস্থান এই ছিল যে

তারা পৈতৃক শাসনের রাজত্ব ব্যবস্থা দূর করে খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলের শুরা ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবেন যাতে উম্মতের উন্নতি সাধন হয়। এজন্য তারা ইয়াজিদের হাতেও বায়াত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশৃঙ্খলা কারীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন ন। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর চিন্তাধারা এই ছিলো যে, তারা নিজেদের মতাদর্শে অটল থাকবেন এবং কোন বিশৃঙ্খলা ছাড়াই নীরবে নিজেদের মতাদর্শ অন্তরে লালন করবেন।

ইয়াযিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুলঃ

ইয়াযিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুল ছিল যে হযরত হুসাইন (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) কে তার বাইয়াত গ্রহণের বাধ্য করেছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যুগেও এমন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যারা তার বাইয়াত গ্রহণে অসম্মত ছিলেন কিন্তু তাদেরকে তিনি সম্মান করেছেন বাইয়াত গ্রহনে বাধ্য করেন নি।এমনকি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সময়েও এমন ব্যক্তিরা ছিলেন যারা তার বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন না এবং তাদেরকে তিনি কোন কষ্ট দেননি।

তাছাড়া সে পূর্ণমাত্রায় উপেক্ষা করেছিল তার পিতার ওসিয়ত, যেখানে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেছিলেন কোন সম্মানিত ব্যক্তির সাথে কঠোরতা করো না এবং নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাউকে বাধ্য করো না।

ওয়ালিদ ইবনে উতবার নিকট ইয়াযিদের প্রতিনিধি প্রেরণঃ

সিংহাসনে আরোহণের পর পরই ইয়াজিদ তার পিতার আযাদকৃত দাস রুযাইককে এই খবর দিয়ে মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে উতবার নিকট পাঠান যে তিনি যেন দ্রুত হযরত হুসাইন (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) কে তার নিকট ডেকে নিয়ে আসে এবং বাইয়াত গ্রহন করেন।

তিনি তাদেরকে তলব করলেন এবং ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহনের জন্য বললেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) জানালেন গোপনে তিনি বাইয়াত গ্রহন করবেন না, পরে করবেন বলে জানালেন। ওয়ালিদ ইবনে উতবা নরম মনের মানুষ হওয়ায় তাদেরকে জোড় করলেন না। তবে তাদেরকে দেখাশোনার জন্য কিছু লোক নিযুক্ত করে দিলেন।

হযরত হুসাইন (রা.) এর মক্কার পথে যাত্রাঃ

হযরত হুসাইন (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) দেশের পরিস্থিতি দেখে বুঝে গেলেন যে ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহন না করলে তাদের সমস্যা হতে পারে। যেহেতু তারা বাইয়াত গ্রহনে বদ্ধপরিকর তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) রাত এর শেষ প্রহরে ফুর এর পথ ধরে মক্কা

রওনা দেন। পরদিন সকালে ওয়ালিদ এটা জানতে পেরে কিছু অশ্বারোহী সৈন্য তার পিছে পাঠায়। কিন্তু তিনি হাতছাড়া হয়ে যান।

এর দুই একদিন পরে হযরত হুসাইন (রা.) পরিবার পরিজনসহ মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। মক্কায় যাওয়ার কারন হলো মক্কা ছিল মদিনার তুলনায় শাম থেকে দ্বিগুন দূরত্বে। আর মক্কা ছিলো পাহাড় পর্বত বেষ্টিত তাই সেখানে পৌছিয়ে তাদের গ্রেফতার করা ছিলো কষ্টসাধ্য। তাছাড়া কাবার সম্মানের কারণে সেখানে প্রশাসনের পক্ষে আপত্তিকর কিছু করা ছিল কঠিন।

বাইয়াত নিতে না পেরে ইয়াজিদ মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ বিন উতবা কে অপসারণ করে মদিনার গভর্নর হিসেবে আমর ইবনে সাঈদ কে নিয়োগ দেন।তিনি ছিলেন কঠোরতায় শীর্ষে। তিনি মক্কা আক্রমণের শপথ করেন।

কুফাবাসীদের হযরত হুসাইন (রা.) এর কাছে চিঠিঃ

কুফাবাসীরা হোসাইন (রা.) কে চিঠি লিখে জানালেন, ‘আমরা ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হতে রাজি নই। আপনি এ মুহূর্তে কুফায় চলে আসুন। আমরা সবাই আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করব।’ পরপর তারা একই মর্মের অনেকগুলো চিঠি পাঠায় এবং প্রতিনিধি পাঠায়।

বার বার চিঠি আসায় এবং প্রতিনিধিদের আগমনে এটাই স্পষ্ট হয় যে পুরো ইরাক ইয়াজিদের আয়ত্তের বাইরে। কুফাবাসীর ডাকে সাড়া দিয়ে হজরত হোসাইন (রা.) তার চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকিলকে ইরাকের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান। আর বলে দেন, যদি সে পরিস্থিতি অনুকূল দেখে এবং ইরাকবাসীর অন্তর সুদৃঢ় ও সুসংহত মনে হয়, তাহলে যেন তার কাছে দূত প্রেরণ করে।

মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) এর কুফায় গমনঃ

মুসলিম ইবনে আকিল(রহ.) কুফায় গিয়ে পৌছালেন। তিনি হানী বিন উরওয়া এর ঘরে আশ্রয় নিলেন। তিনি সেখানে দেখলেন প্রকৃতপক্ষে লোকেরা হুসাইন (রা.) কে চান। কুফার লোকেরা মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) এর কাছেই হুসাইন (রা.) এর পক্ষে বাইয়াত গ্রহন শুরু করলেন। কুফার পরিবেশ সন্তোষজনক দেখে মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) হুসাইন (রা.) এর নিকট এই বলে পত্র প্রেরণ করলেন যে " বারো হাজার মানুষ বাইয়াত হয়ে গেছে; সুতরাং আপনি চলে আসুন।"

সে সময় কুফার গভর্নর ছিলেন নুমান ইবনে বশির (রা.)। তিনি একজন সুবক্তা, জ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। তিনি মুসলিম ইবনে আকিলের আগমন ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে জানা সত্বেও আমলে নিলেন না। তার এই কর্মকাণ্ড থেকে প্রতীয়মান হয় যে তিনি হুসাইন(রা.) এর তৎপরতা ও আন্দোলনকে ফেতনা ও বিদ্রোহ মনে করেন নাই।

কুফার গভর্নর পরিবর্তনঃ

মুসলিম ইবনে আকিলের চিঠি পৌছাতে পৌছাতে কুফার অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে যায় যা হুসাইন (রা.) এর অজানা ছিলো। কুফার কিছু কঠোর সেনাপতি মুসলিম ইবনে আকিলের প্রতি নম্রতা প্রদরর্শনের কারণে গভর্নর নুমান ইবনে বশির (রা.) এর উপর অসন্তুষ্ট হলেন। এই সংবাদ তারা সত্য মিথ্যা মিশিয়ে সিরিয়াতে ইয়াজিদ এর নিকট পৌছালো। তিনি কুফার গভর্নর পরিবর্তন করে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বসরার পাশাপাশি কুফার গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন কুফাবাসীকে হুসাইন (রা.) এর সাথে যোগ দিয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কুফায় গিয়ে বিষয়টি তদন্ত করতে লাগলেন এবং মানুষকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন যে হানী ইবনে উরওয়ার ঘরে হুসাইন (রা.) এর পক্ষে বাইয়াত নেওয়া হচ্ছে। তিনি হানী বিন উরওয়া কে বন্দী করে রাখলেন।

মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) এর শাহাদাতঃ

মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) মেজবান হানী বিন উরওয়াকে ইবনে যিয়াদ এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চার হাজার এর বাহিনী নিয়ে ময়দানে চলে আসেন। ইবনে জিয়াদ ভয়ে প্রাসাদের দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে যান। কুফাবাসী তাদের পুরাতন অভ্যাসটাই পুনরায় প্রকাশ করলো। মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) যকখন সামনে আগাচ্ছিলেন তখন তাকে অসহায় অবস্থায় রেখে একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে দল থেকে পলায়ন করলো।শেষে তার সাথে রইলো মাত্র ৫০ জনের মত [তারিখুত তাবারিঃ৫/৩৯১]। কিন্তু চালাকি করে এরাও পলায়ন করলো। ইবনে যিয়াদ তখন মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) কে ধরার জন্য সিপাহী পাঠালেন। মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) একাই তাদের সাথে লড়ে সেকখান থেকে সরে পড়লেন।

একাকী অসহায়ের মত ঘুড়তে ঘুড়তে অবশেষে তাওয়া নামক এক নারী তাকে আশ্রয় দেন। কিন্তু তাওয়ার চেলে আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আশআসের কাছে গিয়ে এই সংবাদ জানিয়রে দিলো। এরপর মুসলিম ইবনে আকিল (রহ.) কে সেকখান থেকে গ্রেফতার করা হল। ইবনে যিয়াদ

তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে শহীদ করে দিলেন এবং প্রাসাদের চছাদ থেকে নিচে নিক্ষেপ করল। তার সাথে হানী বিন উরওয়াকেও হত্যা করল।

হুসাইন (রা.) এর কুফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং বড় বড় সাহাবীদের নিষেধঃ

হযরত হুসাইন (রা.) মক্কা থেকে কুফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হযরত হুসাইন (রা.) কুফা যাওয়ার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর কাছে অনুমতি চাইলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন , ‘ তোমার পিতাকে যারা হত্যা করেছে, তুমি কি তাদের কাছে যাবে? যারা তোমার ভাইকে অন্যায় অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে সেই গোষ্ঠীর কাছে যাবে? যদি আমার ও তোমার জন্য অবজ্ঞাজনক না হতো তাহলে আমি আমার হাত দিয়ে তোমার মাথা জাপটে ধরতাম এবং যেতে দিতাম না।

হযরত হুসাইন (রা.) তাকে বললেন, যদি আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা হয় তাহলে তাতে আমার কোন্ আফসোস বা আপত্তি নেই; কিন্তু আমি এটা কোনভাবেই সহ্য করতে পারবো না যে, আমাকে মক্কায় হত্যা করা হবে এবং আমার কারণে মক্কার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হবে।[৪, মাজমাউয যাওযায়েদঃ১৫১৩২]

বড় বড় সাহাবীদের নিষেধ সত্বেও হযরত হুসাইন (রা.) থামলেন না। এসব সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.), হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), হযরত আবু সাঈদ খুদরি এবং হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসি, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর।

হযরত হুসাইন (রা.) এর সিদ্ধান্তে অটল থাকার কারণঃ

বড় বড় সাহাবীদের নিষেধ সত্বেও হযরত হুসাইন (রা.) এর না থামার কারন অবশ্যই নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে , কুফায় যাওয়া ছাড়া উদ্দেশ্য সাধনের ২য় কোন পথ খোলা নেই। তাছাড়া হিজাজে বনু উমাইয়াদের নিয়ে তিনি খুব শংকিত ছিলেন। কারণ সুযোগ পেলে তারা বাইয়াতের জন্য পীড়াপীড়ি করবে এবং তাকে প্রয়োজনে হত্যা করে হিজাজের পবিত্র ভূমি রক্তরঞ্জিত করে ফেলবে।

তার ইজতিহাদ ও বিবেচনা অনুযায়ী এই পথ অবলম্বন করাই ভালো মনে করেছিলেন এবং পৈতৃক রাজত্ব শাসনের এই প্রথা বিলুপ্ত করে ইসলামি ও শুরাভিত্তিক শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন। এই কারণে সকলের নিষেধের পরেও তিনি উম্মতের কল্যাণ কামনায় নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

হযরত হুসাইন (রা.) জিলহজ মাসের প্রথম দিকে পরিবারকে সাথে নিয়ে রওনা দিলেন। কিন্তু তার কাছে তখন কুফার সংবাদ কিছুই ছিল না।[৩, তারিখুত তবারি৫/৩৮১]

ইয়াযিদের কাছে হুসাইন (রা.) এর রওনার সংবাদ ও মারওয়ানের পত্রঃ

হিজাজের গভর্নর আমর বিন সাঈদ হযরত হুসাইন (রা.) এর রওনা হতেই দারুল খিলাফাহ দামেশকে ও কুফায় সংবাদ দিয়ে লোক পাঠিয়ে দেন। তিনি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে লেখেন যে, হুসাইন (রা.) তোমার দিকে আসছে। [তারীখে দামেশক-৪/২১২]

মারওয়ান বিন হাকামও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে এ সংবাদ পাঠান। তবে সাথে সাথে পত্রযুগে লিখে পাঠান যে, হুসাইন (রা.)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ফাতিমা (রা.) এর ছেলে। আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে হুসাইন (রা.) এর চেয়ে প্রিয় কেউ নাই। খবরদার! জোশের বশে এমন কিছু করে বসো না, যে কাজের কোন ক্ষতিপূরণ করা না যায়। আর লোকদের তা ভুলানো না যায়। [তারীখে দামেশক-৪/২১২]

মারওয়ান বিন হাকামের উক্ত পত্র দ্বারা বুঝা যায় যে, বনু উমাইয়ার জ্ঞানী গুণী ও লোকেরা হযরত হুসাইন (রা.) কে সম্মান ও ইজ্জত করতো।

কিন্তু আফসোস হল, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এসব জ্ঞানী ও সমঝদার ব্যক্তিদের পরামর্শ কানে নেয়নি। বড়দের সম্মান করা তার আদতের মাঝেই ছিল না। সে ছিল সৈনিকের ছাঁচে গড়া এক যন্ত্রমানব। মারওয়ানের মত বয়োজেষ্ঠ্য উময়ী আমীরের কথার কোন গুরুত্বও তার কাছে ছিল না।

<u>উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে ইয়াযিদের চিঠিঃ</u>

সে সময় ইয়াযিদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে ফরমান পাঠায়। তাতে লিখে যে, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, হুসাইন (রা.) কুফার দিকে আসছেন। হুসাইন (রা.) এর বিষয়ে সব সময়ের মাঝে তোমার সময়টা, সকল শহরের মাঝে তোমার শহর, সকল গভর্ণরদের মাঝে তুমিই বড় পরীক্ষার সম্মুখীন। এমন পরীক্ষা পতিত হয়েই লোকেরা উন্নতী অর্জন করে অথবা গোলামদের মত লাঞ্ছিত হয়ে যায়। [আলমু'জামুল কাবীর-৩/১১৫]

মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করায় শাবাশী দিয়ে ইয়াযিদ লিখেন:

গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র পাহারাদারদের সতর্ক রাখো। যাদেরই সন্দেহ হয় গ্রেফতার করো। যাদের উপর অভিযোগ আছে তাদের পাকড়াও করো। কিন্তু হত্যা কেবল তাকেই করবে, যে তোমার সাথে যুদ্ধ করে। আর আমাকে ঘটমান সকল কিছু জানাতে থাকবে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮১]

ইয়াযিদের উক্ত চিঠি প্রমাণ করে যে, ইয়াযিদ হযরত হুসাইন (রা.) এর কাফেলায় স্বপ্রণোদিত হয়ে কোন প্রকার ধর-পাকড় করতে আদেশ দেননি। বরং যদি অভিযোগ পাওয়া যায়, বা সন্দেহযুক্ত কাজ করে তাহলেই কেবল পাকড়াও করবে। আর তারা যুদ্ধ না করলে তাদের সাথে হত্যার মত কাজ না করতেও নির্দেশ প্রদান করা হয়।
ইয়াযিদ হয়তো ইবনে যিয়াদকে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছে। অথচ ইবনে যিয়াদের মত পাথর দিলের মানুষের জন্য এতটুকু বলা যথার্থ ছিল না।

ইয়াযিদের উচিত ছিল একথা জানানো যে, যদি খারাপ কিছুর সম্ভাবনা হয়, তাহলে যেন হযরত হুসাইন (রা.) কে নিরাপত্তার সাথে তার কাছে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়।

কিন্তু এভাবে স্পষ্ট কিছু না বলা ইয়াযিদের অপূরণীয় ভুল বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

কুফার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে হযরত হুসাইন (রা.) কে বেখবর রাখার অপচেষ্টাঃ

মুসলিম ইবনে আকিল কে হত্যা করার পর ইবনে যিয়াদ এর একমাত্র অপচেষ্টা ছিলো যে এসব খবর যেন হযরত হুসাইন (রা.) কোনভাবেই জানতে না পারেন। তাই সে কুফা থেকে বসরা এবং শামের এলাকাগুলোকে পুরোপুরি আবদ্ধ করে রাখলো যেন হযরত হুসাইন (রা.) পর্যন্ত কেউ পৌছাতে না পারে। অপরদিকে আরব থেকে কেউ আসলেও তাকে খুব ভালোভাবে যাচাই বাছাই এবং বিশ্লেষণ করে তারপর শহরে প্রবেশ করতে দিতো। মুসলিম ইবনে আকিল কে হত্যা করা হয় জিলহজ মাসের ৮ তারিখ এবং তার দু-তিন দিন পর হযরত হুসাইন (রা.) মক্কা ছেড়ে কুফার পথ ধরেছেন।

এমতাবস্থায় তিনি জানতে পারেন নাই কুফার সেই নরম মনের গভর্নর নুমান ইবনে বশির (রা.) আর নেই। তার স্থানে এখন আছেন কঠোর ও পাথরদিল উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ।

যদি এতোটা কড়া পাহারা না হতো, তাহলে হয়তো মক্কার সীমানা পাড় হবার আগেই হুসাইন (রা.) এর কাছে কুফার প্রকৃত অবস্থা জানা হয়ে যেতো। কিন্তু কড়া চেকিং এর কারণে কেউ এ সংবাদ জান্নাতের সর্দারের কানে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে তিনি তার কাফেলা নিয়ে আগে বাড়তে লাগলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

মুসলিম বিন আকীলের হত্যার সংবাদঃ

ইরাকের সীমান্তের কাছে এসে হুসাইন (রা.) সংবাদ পান যে, মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করা হয়েছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

কুফায় এখন নতুন গভর্ণর উবাদুল্লাহ বিন যিয়াদ। সে কঠোরতার সাথে রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহকারী ও সহযোগীদের দমন করছে।
সেই সাথে হুসাইন (রা.) জেনে গেলেন কুফার শিয়াদের প্রতারণা ও গাদ্দারী সম্পর্কেও। যারা চিঠি দিয়ে, দাওয়াত দিয়ে, বড় বড় ওয়াদা কুফায় দাওয়াত দিয়েছিল তাদের। কিন্তু মুসলিম বিন আকীলকে একা রেখে সবাই পালিয়েছে। এমন কি তিনি এতোটাই অসহায় ও নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন যে, রাস্তা জিজ্ঞাসা করার মত কোন সাথী পর্যন্ত পাননি। অবশেষে কথিত শিয়ানে আলীদের সংবাদের ভিত্তিতেই গ্রেফতার হয়ে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন মুসলিম বিন আকীল।
হযরত মুসলিম বিন আকীল মুহাম্মদ বিন আশআছকে হুসাইন (রা.) এর কাছে তার পক্ষ থেকে এ সংবাদ জানাতে বলেন যে,

ارجع بأهل بيتك، وَلا يغرك أهل الْكُوفَة فإنهم أَصْحَاب أبيك الَّذِي كَانَ يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، إن أهل الْكُوفَة قَدْ كذبوك وكذبوني،

তুমি পরিবার পরিজন নিয়ে ফিরে যাও। তুমি কুফাবাসীর ধোঁকায় পড়ো না। কেননা এরাই তারা যারা নিজেদের আপনার পিতার সাথী পরিচয় দিতো। যাদের থেকে মুক্তি পেতে আপনার পিতা মরে যেতে বা নিহত হওয়ার তামান্না করতেন। নিশ্চয় এ কুফাবাসী আপনার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং আমার সাথেও মিথ্যা বলেছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৭৫, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৫৯]

হুসাইন (রা.) মুসলিম বিন আকীলের উক্ত সংবাদ শুনে কুফাবাসীর গাদ্দারী বুঝে যান। তাই তিনি ফিরে যেতে মনস্ত করলেন।

কিন্তু যখনি তিনি ফিরে যাবার প্রস্তুত নিচ্ছেন তখন মুসলিম বিন আকীলের যে স্বজনরা তার সফরসঙ্গী ছিলেন তারা জোশের সাথে বলতে লাগলেন: "আল্লাহর কসম! আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম বিন আকীলের খুনের বদলা না নিবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফিরে যাবো না। যদিও সবাই শহীদ হয়ে যাই"। একথা শুনে হুসাইন (রা.) বললেন, তোমাদের ছাড়া আমার বেঁচে থেকে কী ফায়দা? [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

হুসাইন (রা.) মুসলিম বিন আকীলের শহীদ হবার খবর শুনে ফিরে যাবার বিষয়টি শিয়াদের লিখিত গ্রন্থাবলীতেও স্পষ্ট শব্দে উল্লেখ হয়েছে।
যেমন: জালাউল উয়ূন, মোল্লা বাকের মাজলিসীকৃত-১/২৬৩, নাসেখুল তাওয়ারীখ, লিসানুল মুলক মীর্যা মুহাম্মদ তক্বীকৃত-২/৩২১]

শিয়া ঐতিহাসিকরাও একথা স্বীকার করে যে, মুসলিম বিন আকীলের শাহাদাতের সংবাদ শুনে হযরতে হুসাইন (রা.) মক্কায় ফিরে যেতে চাইলেন। কারণ, তিনি বুঝে গেছেন যে, শিয়ারা ধোঁকা দিয়েছে। ভবিষ্যতেও এমন করবে। তাই ফিরে যাওয়াই অধিক উপযোগী। কিন্তু মুসলিম বিন আকীলের স্বজনদের জন্য ফিরতে পারেননি।

এখানে ভাবনার বিষয় হল, যদি হুসাইন (রা.) এর কুফায় আগমণের উদ্দেশ্য মৃত ইসলামকে জিন্দা করা, দ্বীন রক্ষার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম বিন আকীলের মৃত্যু সংবাদ শুনে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন কেন?

বরং আরো জোশের সাথেই বলা উচিত ছিল যে, আমার ভাই শহীদ হয়েছে তো কী হয়েছে। আমি আমার অবস্থানে অনড়। যতক্ষণ না দ্বীন জিন্দা হবে, আমরা আমাদের অবস্থানে অনড় ও অবিচল থাকবো।

সুতরাং কারবালার ঘটনার মাধ্যমে ইসলাম জিন্দা করা মাকসাদ ছিল না। বরং পরিবারতন্ত্র যেন প্রতিষ্ঠা না পায়, তা থেকে বাঁধা দেয়াই কেবল মাকসাদ ছিল। ইয়াযিদের ফাসিক হওয়ার বিষয়টি তখন পর্যন্ত পরিস্কার ছিল না।

এ সময় কুফা থেকে আসা সফরসঙ্গী ৬০ শিয়ারা আশ্বাস দিয়ে বলে যে, "আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই আপনি মুসলিমের চাইতে বেশী মর্যাদা রাখেন। আপনি যদি কুফায় যান জনগণ আপনার ডাকে সাড়া দিবে"। [শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১৪৭]

কুফী শিয়ারা যে কোন মূল্যে হুসাইন (রা.) কে কুফায় নেবার জন্য মরিয়া ছিল।

হযরতে হুসাইন (রা.) অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুফার দিকে আবার যাত্রা করলেন। আলমুগীছা অঞ্চল থেকে একটু সামনে কুফা জেলার সীমান্তে পৌঁছে গেলেন। যেখানে ইবনে যিয়াদের বাহিনী পাহারায় নিয়োজিত ছিল। এখানেই হযরত হুসাইন (রা.) এর সাথে ইবনে যিয়াদের সেনা কমান্ডার হুর বিন

ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

হুর বিন ইয়াযিদের পরামর্শঃ

হুর বিন ইয়াযিদ ছিলেন একজন ভদ্রলোক এবং তিনি হযরত হুসাইন (রা.) এর কল্যাণকামী ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছেন?

যখন কুফায় যাবার কথা শুনলেন, তখন খুব শক্তভাবে যেতে বারণ করলেন। বললেন, আপনি ফিরে চলে যান, সেখানে আপনার জন্য কল্যাণের আশা নেই।

এসব শুনে হযরত হুসাইন (রা.) কুফায় না গিয়ে দামেশকে গিয়ে ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাৎ করার মনস্থ করলেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে এতোটাই অটল ছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ কুফার রাস্তা পাল্টে শামের দিকে রওনা করলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

এর কারণ ছিল এই যে, হযরত হুসাইন (রা.) নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বুঝে গেলেন যে, ইয়াযিদের খেলাফত আসলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কুফার শিয়ারা তাকে ভুল তথ্য দিয়ে এখানে টেনে এনেছে। একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বিরোধীতা করাটা রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল।

সুতরাং তিনি শরয়ী সীমায় থেকে বিকল্প পন্থাকে বেছে নিলেন। চাইলেন যে, দামেশকে গিয়ে ইয়াযিদের সাথে মুলাকাত করতে। হতে পারে সরাসরি সাক্ষাতে ও আলাপচারিতায় উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

হুসাইন (রা.) এর সিদ্ধান্ত দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, ইয়াযিদের খেলাফতের মৌলিক কিছু ভুল থাকার পরও শরীয়তে সুযোগ থাকার কারণে উম্মতের একতা ও ভ্রাতৃত্বের খাতিরে যেসব সাহাবাগণ ইয়াযিদকে খলীফা মেনে নিয়েছে তাদের মতামতটিকে তিনি সম্মান জানাতেন। যদিও তিনি নিজে আজীমতের উপর আমল করেছেন।

হুসাইন (রা.) এর কুফায় গমণটাও নেতৃত্ব দখল ছিল না। বরং সেই মৌলিক ভুলটিকে শোধরানো মাত্র। কুফায় গিয়ে তিনি লোকদের একত্র করে হয়তো একাজটিই করতে চাচ্ছিলেন।

কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তিত দেখে তিনি সরাসরি ইয়াযিদের সাথেই এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনাকে জরুরী মনে করলেন। এছাড়া আর কোন রাস্তাও অবশ্য ছিল না।

যদিও একথা স্পষ্ট ছিল যে, কুফা ও দামেশকের পলিসি একই হবে। উভয় স্থানেই হুসাইন (রা.) কে রাষ্ট্রদ্রোহী মনে করা হচ্ছে।

কিন্তু হুসাইন (রা.) ইবনে যিয়াদের কঠোর নীতি দেখে তিনি বুঝে গেছেন যে, ইয়াযিদ আমার সাথে ইবনে যিয়াদের মত এমন কঠোরতা করবে না। কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে অন্তত আমার মতামত জানতে চাইবে। যা ইবনে যিয়াদের ক্ষেত্রে ভাবা যায় না।
হযরতে হুসাইন (রা.) এর ইয়াযিদের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক ও যথার্থ ছিল। এ কারণেই হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদতের পর ইয়াযিদ বলতেন যে, ‘আমার কি বিগড়ে যেতো যদি আমি

কিছু কষ্ট সহ্য করে নিতাম। হুসাইন (রা.) কে নিজের ঘরে ডেকে নিতাম। তিনি যা চান তাই নিতে তাকে ক্ষমতা দিতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় এর হক এর এটাইতো তাকাযা ছিল। যদিও তাতে আমার হুকুমতের শক্তি ও শওকত হ্রাসই পেতো'। [তারীখে তাবারী-৫/৫০৬]

হুসাইন (রা.) কুফার রাস্তা রেখে দামেশকের দিকে প্রায় ৪৫ মাইল সাড়ে ৭২ কিলোমিটার সফর করে কারবালা নামক স্থানে এসে পোঁছে গেলেন। যা কুফা থেকে দামেশ যাবার মহাসড়কে অবস্থিত। ফুরাত নদীর পাড়ও ছিল নিকটে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

ইবনে যিয়াদ এর চাওয়াঃ

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ চাইলে হুসাইনী কাফেলাকে দামেশকের দিকে যেতে দিতে পারতো কিন্তু তা করেনি। আফসোসের বিষয় হল, চরম ধৃষ্টতার সাথে সে হুসাইন (রা.) কে দামেশকের দিকে যেতে না দিয়ে গ্রেফতার করে তার কাছে নিয়ে আসার স্পর্ধাসূচক আদেশ জারী করে।

তাহলে কি ইয়াযিদের পক্ষ থেকে হুসাইন (রা.) কে এভাবে গ্রেফতার করার নির্দেশ ছিল?

বাস্তব কথা হল, হযরত হুসাইন (রা.) ইরাক সীমান্তে পৌছার পর থেকে দশে মহররম পর্যন্ত কুফা ও দামেশকের মাঝে কোন প্রকার যোগাযোগ ও কথোপকথন করা সম্ভব ছিল না।

কারণ, কুফা ও দামেশকের মাঝে দূরত্ব ৯০৪ কিলোমিটার। কোন দ্রুতগামী ঘোড়াও যদি প্রতিদিন একশ' কিলোমিটার সফর করে তবুও দামেশক পৌছাতে নয় থেকে দশ দিন লেগে যাবে। আবার সেখান থেকে নতুন পয়গাম নিয়ে কুফা আসতেও এমন সময় লাগতো।

এর মানে ইয়াযিদের কাছ থেকে কুফায় পয়গাম আসতে কমপক্ষে ১৮ কিংবা ১৯ দিনের দরকার। অথচ হুসাইন (রা.) ইরাক সীমান্তে আসার পর থেকে কারবালায় হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত ৫দিন সময়ও অতিক্রম করেনি। বরং ১০ই মুহররমই সকলকে শহীদ করে ফেলা হয়।

এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, কারবালা প্রান্তরে ইবনে যিয়াদ কর্তৃক হত্যাযজ্ঞে ইয়াযিদের সরাসরি কোন নির্দেশ ছিল না।
বরং ইয়াযিদের আগের নির্দেশনা অনুপাতে সব ধরণের পদক্ষেপের জন্য নিজেকে উপযুক্ত মনে করে একক সিদ্ধান্তে সে তা করেছে। নতুন কোন নির্দেশের প্রয়োজন অনুভব করেনি। ইয়াযিদের আগের নির্দেশনা ছিল কুফাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

কুফার লোকজন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত হুসাইন (রা.) ও পরিস্থিতি আঁচ করে কুফার বদলে দামেশকে যাবার জন্য যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন। এর মানে হুসাইন (রা.) এর কারণে কুফায় কোন প্রকার অস্থিরতা হবার সুযোগই ছিল না।

তারপরও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হুসাইন (রা.) কে দামেশক যেতে দিলো না কেন? তারতো এজন্য খুশি হবার কথা যে, সে তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা পুরোপুরি শান্ত ও নিরাপদ রেখেছে। একটি পরীক্ষা থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু এরপরও এমন পৈশাচিক কাজের কারণ-

আসলে ইবনে যিয়াদের কর্মকাণ্ড থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন কঠোর মানসিকতা সম্পন্ন কমান্ডার ছাড়া কিছু নয়। তার দৃষ্টিতে হযরত হুসাইন (রা.) ছিলেন রাষ্ট্রের বিরোধী একজন ভয়ানক বিদ্রোহী মাত্র। বিদ্রোহী চরম পর্যায়ের অপরাধী হয়ে থাকে। এমন অপরাধীকে ক্ষমা করা যায় না।

এছাড়া তার মাথায় স্বৈরতান্ত্রিক দাপুটে শাসকের ভূতও সওয়ার হয়েছিল। সে যেভাবে মুসলিম বিন আকীল (রহ.) এবং হুর বিন উরওয়াকে প্রকাশ্যে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তেমনি হুসাইন (রা.) কে হত্যা করে নিজের ক্ষমতার ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছে। যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস করবেতো দূরে থাক কল্পনাই করতে না পারে।

যদি ইবনে যিয়াদের শুধুমাত্র তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কুফার ষড়যন্ত্রকারীদেরই নির্মূল করাই মাকসাদ হতো, তাহলে নুমান বিন বশীর (রা.) কে বরখাস্তকরণ এবং কুফায় তার নিয়োগ, আহলে ইরাকের উপর পূর্ণাঙ্গ আধিপত্য, মুসলিম বিন আকীল ও হুরকে হত্যা করার সংবাদ হযরত হুসাইন (রা.) এর কাছে পৌছাতে দিতো। যাতে করে হুসাইন (রা.) কুফায় আসার চিন্তাই বাদ দিয়ে দেন।

কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.) পর্যন্ত উপরোক্ত পটপরিবর্তনের সংবাদ না পৌছানোর জন্য শহরের সীমান্ত জুড়ে কড়া অবরোধ আরোপ করে সেই পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে হযরত হুসাইন (রা.) সঠিক সময়ে সংবাদই পাননি।

এ কারণেই হযরত হুসাইন (রা.) কুফার সীমান্তে এসে গেছেন। আসলে ইবনে যিয়াদ এটাই চাচ্ছিল যে, হযরতে হুসাইন (রা.) বেখবর অবস্থায় কুফায় আসবেন আর তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় গ্রেফতার করা হবে।
সে যেন এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, সে কতবড় রাজনীতিবীদ! কত শক্তিমান শাসক। হযরত হুসাইন (রা.) এর মত ব্যক্তিত্বকে নিজের জালে আটকে ফেলেছে।

এজন্যই সে সীমান্তবর্তী টহল বাহিনীকে অর্ডার দিয়ে রেখেছিল যে, হযরত হুসাইন (রা.) আসার সাথে সাথে দ্রুত গ্রেফতার করে যেন তার দরবারে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.) এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন।
সেনা কমান্ডার হুর বিন ইয়াযিদ নবী পরিবারের প্রতি মোহাব্বত, তার কোমল হৃদয়ের কারণে হুসাইন (রা.) কে গ্রেফতার না করে চলে যেতে সুযোগ করে দেন।

উমর বিন সা'দের কারবালা রওনাঃ

ইবনে যিয়াদ এবার উমর বিন সা'দকে তেহরানের গভর্ণরী দেবার আশ্বাস দিয়ে হুসাইন কে নিঃশর্তে গ্রেফতার করার দায়িত্ব অর্পণ করে আদেশ করে: যদি হুসাইন (রা.) স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে যেন হত্যা করা হয়।
যেহেতু হুসাইন (রা.) এর মত ব্যক্তিত্বের উপর হাত উঠানো কিয়ামত পর্যন্ত বদনামীর কারণ হবে, তাই উমর বিন সা'দ এ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

কিন্তু ইবনে যিয়াদ তার বাড়ি ঘর ধ্বংস করা এবং গর্দান উড়িয়ে দেবার ধমকি প্রদান করে। [তাবক্বাতে ইবনে সা'দ-৫/১৬৮]

উমর বিন সা'দ সকাল পর্যন্ত ভাবার জন্য সুযোগ চায়। সারা রাত চিন্তা করে সকালে সম্মতি জানিয়ে বাহিনী নিয়ে কারবালা প্রান্তরে পৌছে যায়। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

কারবালার প্রান্তরঃ

হিজরী ৬১ হিজরীর ৯ই মহররম।
কারবালা প্রান্তরে সরকারী বাহিনীর অফিসার উমর বিন সা'দ, শিমার বিন জিলজাওশান এবং হুসাইন বিন নুমাইরের সাথে হযরত হুসাইন (রা.) এর আলোচনা হয়। হযরত হুসাইন (রা.) তাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের ওয়াস্তা দিয়ে বলেন,

،أَنْ يُسَيِّرُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَزِيدَ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ

আমাকে আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদের কাছে যাবার সুযোগ দিন। আমি আমার হাত তার হাতে দিয়ে দেবো। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৭০]

কিন্তু ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন (রা.) কে শর্তহীনভাবে গ্রেফতার করার আদেশ ছিল। তাই সেনাপ্রধান জবাব দিল: "এছাড়া কোন পথ নেই যে, আপনি সিদ্ধান্তের জন্য নিজেকে ইবনে যিয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৭০]

হুসাইন (রা.) এর তিন প্রস্তাব-

যখন সকল পথ রুদ্ধ হতে দেখলেন তখন হুসাইন (রা.) দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। যথা-

১)আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফেরত যাবার সুযোগ দেয়া হোক।

২)ইয়াযিদের কাছে যাবার সুযোগ দেয়া হোক। যেন তার হাতে বাইয়াত হতে পারেন। তাদের ভিতরকার মতভেদ যেন দূরিভূত হয়ে যায়।

৩)ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে পৌছে দেয়া হোক। যেন তিনি অন্যান্য মুসলমানদের মতই জীবন যাপন করতে পারেন।

উমর বিন সা'দ এ প্রস্তাব মেনে নেয়। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে এ বিষয়ে জানায়। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তা অস্বীকার করে। শর্ত ছাড়া গ্রেফতার করার জন্য জোর নির্দেশ প্রদান করে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৯৭]

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ প্রথমত হযরত হুসাইন (রা.) এর প্রস্তাব মেনে নিতে চাইলেন। কিন্তু শিমার বিন জিলজাওশান তাকে বুঝায় যে, শর্তহীন গ্রেফতারটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। যাতে করে সব কিছু হুকুমতের অধীন থাকে।

শিমার উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বলে, আল্লাহ দুশমনকে আপনার কাবুতে এনে দিয়েছেন। আপনি তাকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন? [তারীখে তাবারী-৫/৪১৩-৪১৪, আলমিহান-১৫৪]

শিমারের কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হুসাইন (রা.) এর শান্তি প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। [আলমিহান-১৫৪] আবারো শর্তহীন আত্মসমপর্ণের জন্য হুসাইন (রা.) কে বলা হয়। কিন্তু এভাবে অসহায় আত্মসমর্পণ কেবল নবী পরিবারের অসম্মানই নয়, বরং সেই মহান উদ্দেশ্যও ধুলায় মিশে যায়, যে উদ্দেশ্য সফলের লক্ষ্যে নিজের পরিবারের সদস্য পর্যন্ত ঝুঁকির মুখে নিক্ষেপ করেছেন।

এ কারণে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, কিছুতেই তিনি শর্তহীন আত্মসমর্পণ করবেন না। [তারীখে তাবারী-৫/৩৩৯]

গ্রেফতার না হওয়ার কারণ -

এখানে অনেকের কাছেই আশ্চর্যের বিষয় যে, হুসাইন (রা.) ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হতে রাজী হবার পরও কেন ইবনে যিয়াদের কাছে বাইয়াত হতে রাজী হননি? অথচ ইবনে যিয়াদতো নিজের বাইয়াত নয়, বরং ইয়াযিদের আনুগত্যেরই বাইয়াত গ্রহণ করতো।

আসলে যারা এমনটি ধারণা করে থাকেন, তারা হুসাইন (রা.) এর মূল লক্ষ্য সম্পর্কে লক্ষ্য না করার কারণেই এমন প্রশ্ন করছেন। তারা হুসাইন (রা.) কে সাধারণ ক্ষমতালোভী সাধারণ কেউ মনে করছে। নাউজুবিল্লাহ।
তারা এমনটা মনে করছেন যে, হুসাইন (রা.) শুধুমাত্র প্রাণরক্ষার তাগিদে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হতে রাজী হয়ে গেলেন। যে বাইয়াতের তিনি শুরু থেকে বিরোধী ছিলেন।

যদি তিনি প্রাণরক্ষার জন্যই এমনটি করে থাকেন, তাহলে নিজের চেয়ে চারগুণ বেশি প্রশিক্ষিত রাষ্ট্রীয় সৈন্যের বিপরীতে কেন মাথা ঝুঁকাননি? কেন নির্মমভাবে মাথা উঁচু করে কারবালা প্রান্তরে শাহাদতের পেয়ালা পান করেছেন?

আসল বিষয় হল, হযরত হুসাইন (রা.) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের আজিমত ও ইজতিহাদী অবস্থানের উপর অটল ছিলেন।
তিনি যেহেতু কুফী শিয়াদের পত্র ও দূতদের মাধ্যমে জেনেছেন যে, কুফীরা সবাই হুসাইন (রা.) এর অপেক্ষায়। তারা কেউ ইয়াযিদের পক্ষে নয়। তারা হুসাইন (রা.) এর নেতৃত্ব চায়। আর ইয়াযিদের ক্ষমতায় আরোহন পদ্ধতি পূর্ববর্তী খলীফাগণের স্বীকৃত পদ্ধতিতে ছিল না। তাই এ পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। যাতে করে এটি প্রচলিত হয়ে বংশীয় শাসনের ধার চালু হয়ে না যায়।

এ দু'টি মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে হযরতে হুসাইন (রা.) কুফায় আগমণ করেন। এসে যখন দেখলেন যে, কুফার শিয়ারা মিথ্যা বলেছে। আসলে পুরো ইরাক ইয়াযিদের খেলাফত মেনে নিয়েছে। তারা সকলেই ইয়াযিদের ঝান্ডার নিচে ঐক্যবদ্ধ। কেউ ইচ্ছেয়, কেউ অনিচ্ছায়। কিন্তু সকলেই ইয়াযিদের নেতৃত্ব ও হুকুমত মেনে নিয়েছে।

আর চিঠি লেখক কুফীরা। যারা নিজেদের শিয়া দাবী করেছে এরা সকলেই গাদ্দারী করে পলায়ন করেছে। তখন তিনি সরাসরি ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তার হাতে বাইয়াত হতে চাইলেন। যাতে করে তার মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে সরাসরি কথা বলে একটি সুরাহা বের করতে পারেন। যা রাজনৈতিক সন্ধি হবে।

এ সন্ধির ক্ষমতা কেবল ইয়াযিদের হাতেই আছে। উবায়দুল্লাহ যিয়াদের হাতে নেই। কারণ, সে কেবল একজন গভর্ণর। ইয়াযিদের হুকুমের গোলাম। এ কারণে তার হাতে বাইয়াত হয়ে কোন লাভ নেই। তাছাড়া সে নিঃশর্ত বাইয়াত নিয়ে হুসাইন (রা.) এর মূল উদ্দেশ্যের উপরই পানি ফেলে দিচ্ছিল। এ কারণে হযরতে হুসাইন (রা.) তার আদর্শের জন্য শহীদ হতে রাজী হলেন, কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিতে রাজী হলেন না।

কারবালার যুদ্ধ কি ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ ?

হযরত হুসাইন (রা.) ও উমর বিন সা'দ এর মধ্যকার আলোচনা এবং হুসাইন (রা.) এর তিন প্রস্তাবের দিকে একটু ভালো করে নজর দিলে আমাদের কাছে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়।

ক) ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হতে চাওয়া।

খ) ইয়াযিদের শাসনকৃত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া।

গুরুত্বপূর্ণ এ দু'টি বিষয় এতে চলে আসছে। এর মানে ইয়াযিদের নিয়োগ পদ্ধতি হুসাইন (রা.) এর পছন্দ না হলেও, তিনি ইয়াজিদের শাসনকে কুফরী শাসন মনে করতেন না। তার হাতে বাইয়াত হওয়াকে কাফেরের হাতে বাইয়াত মনে করতেন না।

আর কারবালায় আগমণ ইসলাম ও কুফরীর পার্থক্য নির্ণয়ক বিষয় ছিল না।

যদি ইয়াযিদ তখন পর্যন্ত কাফের হতো। ইসলাম বিকৃতকারী হতো। ইসলামের দুশমন হতো। নবীজীর দুশমন হতো। তাহলে হুসাইন (রা.) কিভাবে তাকে আমীরুল মুমিনীন বলেন? কিভাবে তার হাতে বাইয়াত হতে বলেন? কিভাবে তার অধীনত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলেন?

তাহলে কি হুসাইন (রা.) কাফেরের হাতে বাইয়াত হতে চেয়েছেন? ইসলাম বিকৃতকারী, ইসলামের দুশমনের হাতে বাইয়াত হতে চাইলেন?

অবশ্যই নয়। হতেই পারে না।

হ্যাঁ। একথা ঠিক যে, ইয়াযিদের কারবালা ঘটনায় সম্পৃক্ততা এবং পরবর্তীতে হাররার ঘটনা ইত্যাদির মাধ্যমে ফাসেকী পরিস্কার হয়ে যায়। তার ঘৃণ্য চেহারা ফুটে উঠে। যা হুসাইন (রা.) এর কুফায় আগমণ পর্যন্ত পরিস্কার ছিল না।

কারবালার যুদ্ধঃ

কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবার পরও উমর বিন সা'দ যুদ্ধ না করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইবনে

যিয়াদ কুফায় বসে পুরো পরিস্থিতির ক্ষণে ক্ষণে সংবাদ রাখছিল। সে কড়া নির্দেশ প্রদান করে জুআইরিয়া বিন বদর তাইমীকে পাঠায় যে, উমর বিন সা'দকে বল যে, দ্রুত হামলা করতে, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে।

উমর বিন সা'দ সেদিন সুযোগ দিল হুসাইন (রা.) কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য।

পরদিন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কড়া নির্দেশ পাবার পর উমর বিন সা'দ হাতিয়ার নিল এবং যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা দিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

৬১ হিজরীর মহররম মাসের ১০ তারিখ।

শুক্রবার মতান্তরে শনিবার উমর বিন সা'দ তার সঙ্গীদের নিয়ে ফজরের নামায শেষে যুদ্ধের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, সে দিন ছিল আশুরার দিন।

এদিকে হযরত হুসাইন (রা.) ও তার সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়লেন। আর তারা ছিলেন বত্রিশজন অশ্বারোহী এবং চল্লিশ পদাতিক যোদ্ধা। এরপর তিনি তাঁদেরকে সারিবদ্ধ করলেন। ডানপাশের কমান্ডার বানালেন যুহাইর বিন কায়সকে আর বাম পাশের জন্য নির্ধারণ করলেন হাবীব বিন মুতাহহারকে। তাঁর ঝাণ্ডা প্রদান করলেন তাঁর ভাই আব্বাস বিন আলীকে। আর তাদের সঙ্গের মেয়েদেরকে তাঁবুগুলিতে তাদের পেছনে নিয়ে আসলেন।

এদিকে হুসাইন (রা.) এর নির্দেশমত রাতেই তারা তাদের তাঁবুর পেছনে পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানি কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ফেলে রেখেছিলেন। এরপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। যাতে করে পেছন থেকে কেউ তাঁবুর কাছে ঘেষতে না পারে। আর উমর বিন সা'দ তার বাহিনীর ডান পার্শের কমান্ডার বানালো আমর বিন হাজ্জাজ আয যুবাইদীকে। বাম পাশের জন্য শিমার বিন জুলজাওশানকে।

অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আযরাহ বিন কায়স আল আহমাসী। আর পদাদিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল শাবীছ বিন রিবয়ীর। আর ঝান্ডা ছিল ওয়ারদানের হাতে।

উভয় পক্ষ স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে থাকলো। [আলবিদায়া ওয়াননিয়াহা-৮/১৭৮, আরবী, ৮/৩৩৩, বাংলা]

হুসাইন (রা.) এর গায়ে মোটা জোব্বা ছিল। উমর বিন সা'দের বাহিনীর উমর তাহয়ী নামক সৈন্য তীর ছুড়ল। তীর গিয়ে হুসাইন (রা.) এর কাঁধে এসে আঘাত করল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

এ সময় কুফার ঘোরসওয়ার বাহিনীর কমান্ডার হুর বিন ইয়াযিদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠল। সে সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধাংদেহী মনোভাব দেখে তিরস্কার করে বলতে লাগল, তোমরা কি হুসাইন (রা.) এর আবেদন গ্রহণ করবে না? আল্লাহর কসম! যদি এমন দরখাস্ত তুর্কিস্তান ও দায়লামের কাফেররাও করতো, তাহলে তা তোমাদের জন্য রদ করা জায়েজ হতো না।

এতে করে সৈন্যদের মাঝে কোন প্রভাব সৃষ্টি হয়নি। তখন তিনি বেশ নিজ বাহিনী ছেড়ে হুসাইন (রা.) এর বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাদের সাথে শরীক হয়ে গেলেন।

তার পূর্ব আচরণের জন্য হুসাইন (রা.) এর কাছে ক্ষমা চাইলেন। বলেন, আমি যদি আগে তাদের ইচ্ছের কথা জানতাম, তাহলে আমি আপনার সাথে ইয়াযিদের কাছে যেতাম।

এরপর তিনি বাহিনীর সামনে এসে উমর বিন সা'দকে বললেন, দুর্ভাগ্য! তোমাদের নবীর দৌহিত্রের প্রস্তাবিত তিনটি বিষয়ের একটিও কি তোমরা গ্রহণ করবে না? তখন সে বলল, তা গ্রহণ করার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো, তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৮০, ৮/৩৩৬]

তারপর যুদ্ধ শুরু হল। হুর বিন ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদের বাহিনীর উপর হামলা করলেন। দুইজন সৈন্যকে হত্যা করে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। [তারীখে তাবারী-৩/৩৯২]

যুদ্ধকালে এক বদবখত দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিল: তোমাদের মাঝে কি হুসাইন আছে?
উত্তর আসল: আছে। তখন সে বলল, তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও।
হযরত হুসাইন (রা.) শুনে বললেন, না বরং আল্লাহ তাআলা ক্ষমাকারী। তিনি মেহেরবান এবং দয়ালু। যার আনুগত্য করা হয়।
তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি কে?
সে বলল, আমি হাওজা এর ছেলে।
তখন তিনি অবচেতনে বলে ফেললেন, হে মালিক! তাকে জাহান্নামে টেনে নাও।
সে সময় তার ঘোড়া আচমকা ছুটতে শুরু করে। ফলে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। তার পা রিকাবে আটকে যায়। ঘোড়া তাকে হেচড়াতে হেচড়াতে নিয়ে চলে। এর ফলে তার পুরো শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। রেকাবে শুধু তার পা দু'টি বাকি থাকে। [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-৩৭৩৬৯, আলমু'জামুল কাবীর, তাবারানীকৃত-৩/১১৬]

হুসাইন (রা.) এর ছেলে আব্দুল্লাহ এর শাহাদতঃ

আব্দুল্লাহ অত্যান্ত সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। এক কুফী সৈন্য তাকে দেখে বলল, তাকেতো আমি অবশ্যই হত্যা করবো।
অন্যান্যরা বুঝাল যে, এমন ছোট্ট নাবালেগ শিশুকে হত্যা করে তোর কী ফায়দা?
কিন্তু সেই কুফী তার উপর হামলা করল এবং তাকে হত্যা করল। যখন তার উপর আঘাত করছিল, তখন আব্দুল্লাহ চিৎকার বলে উঠলেন: হে চাচা!
হযরত হুসাইন (রা.) আওয়াজ শুনে বলতে লাগলেন: এমন ব্যক্তির আওয়াজে লাব্বাইক, যার সাহায্যকারী কম কিন্তু দুশমন অনেক বেশি।
হুসাইন (রা.) হামলাকারীর উপর আক্রমণ করে এক আঘাতে তার এক হাত এবং আরেক আঘাতে তাকে হত্যা করেন। তারপর আম লড়াই শুরু হয়ে গেল। [আলমিহান-১৫৪]

চিঠি পাঠানো শিয়া কুফীদের গাদ্দারীঃ

হুসাইন (রা.) কুফার পরিবর্তে যখন দামেশক যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন, তখন কুফী শিয়ারা চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে শুরু করে। তাদের মূল মাকসাদই ছিল হুসাইন (রা.) কে ভুল বুঝিয়ে কুফায় এনে একটি হাঙ্গামা সৃষ্টি করা। কিন্তু হুসাইন (রা.) পরিস্থিতি বুঝে যান এবং চিঠি লেখক শিয়াদের মিথ্যাচার নিজ চোখে অবলোকন করেন।

শিয়াদের লক্ষ্য করে হুসাইন (রা.) এর বক্তব্য আমরা শিয়াদের গ্রন্থ থেকে একটু দেখে নেই:

হুসাইন (রা.) কুফীদের লক্ষ্য করে বলেন, আফসোস! তোমরাতো ঐ লোক! যারা আমার পিতা হযরত আলী (রা.) কে ধোঁকা দিয়েছো। তারপর তাকে শহীদ করেছো। তারপর আমার ভাই হাসান (রা.) কে আহত করেছো। আমার চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকীল (রহ.) কে কুফায় কতল করেছো। সত্য কথা হলো, যারাই তোমাদের প্রতারণায় ফেঁসে গেছে তারা বড় আহাম্মক। [জালাউল উয়ূন]

হুসাইন (রা.) বলেন হে জনতা! তোমরা যেন ধ্বংস হও। দুর্দশাগ্রস্ত হও। তোমরা উৎসাহের সাথে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে তোমাদের সাহায্য করার জন্য এবং আমরা তা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু তোমরা এখন সে তরবারিগুলো কোষমুক্ত করেছো যা আমরা তোমাদের দিয়েছি এবং তোমরা আমাদের জন্য আগুন জ্বালিয়েছো যা আমরা তোমাদের ও আমাদের দুশমনদের জন্য জ্বালিয়েছিলাম। তোমরা তোমাদের দুশমনদের পক্ষ নিয়েছো এবং তাদের সাথে থেকে তোমাদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হয়েছো। [শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১/১৯৯-২০০]

হুসাইন (রা.) এর আরেকটি বক্তব্য আসছে শিয়াদের গ্রন্থে সেটি হল -
হে কুফার লোকেরা, তোমাদের মায়েরা তোমাদের হারাক। তোমরা আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে, এরপর যখন তিনি তোমাদের কাছে এলেন, তোমরা তাকে দুশমনের হাতে তুলে দিলে। অথচ তোমরা তার জীবন রক্ষার্থে জীবন দিতে চেয়েছিলে। এখন তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছো তাকে হত্যা করার জন্য। তোমরা তাকে আটক করেছো এবং তার জামার কলার ধরেছো এবং তাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করেছো যেন তিনি আল্লাহর প্রশস্ত শহরগুলোতে পালিয়ে যেতে না পারেন। [শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১/২০৭-২০৮]

হযরত হুসাইন (রা.) চিঠি প্রদান করে কুফায় দাওয়াত দেওয়া এসব শিয়া নামধারী গাদ্দারদের পল্টিবাজী দেখে দামেশক যাবার মনস্থ করেন। কিন্তু এসব গাদ্দাররা তখন তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবার আতংকে পড়ে যায়। কারণ, হুসাইন (রা.) এর সাথে তাদের চিঠি ছিল যেখানে তাদের নামও ছিল। যারা হুসাইন (রা.) কে কুফায় এসে তাদের বাইয়াত নিয়ে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দিয়েছিল।

এখন দামেশকে গিয়ে এসব ইয়াযিদকে দেখালে এসব চিঠি লেখকরা সব রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিচারের মুখোমুখি হবে। তাই তারা কিছুতেই চাচ্ছিল না যে, হুসাইন (রা.) দামেশকে যান।
তাই তারা দ্রুতই হুসাইন (রা.) এর দলত্যাগ করে তাকে হত্যায় সহযোগিতা শুরু করে। যাতে করে তাদের গাদ্দারীর প্রমাণ বাকি না থাকে।

কুফার কিছু লোকেরা কারবালা প্রান্তরের বিভিন্ন উচু স্থানে দাড়িয়ে দৃশ্য দেখছিল। হুসাইন (রা.) এর সহায়তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআও করতে ছিল। যেন আসমান থেকে সাহায্য এসে হুসাইন (রা.) কে উদ্ধার করে। কিন্তু নিজেরা কিছুই করতে রাজী নয়।
তখন একজন ওদের বলে যে, আরে আল্লাহর দুশমনেরা! একটু নিচে এসে হুসাইন (রা.) কে সাহায্য করছো না কেন?
কিন্তু তারা কোন উত্তরও না দিতে পারলো না। সাহায্য করতে এগিয়েও এলো না। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদতঃ

হুসাইন (রা.) ছিল এর সাথে শ'য়ের কাছাকাছি লোক। তাদের মাঝে হযরত আলী (রা.) এর ৫ ছেলে ছিল। বনু হাশেমের ছিল ১৬ জন। বনু সালীম এবং বনু কেনানার এক এক দল ছিল। ইবনে উমর বিন যিয়াদ নামের এক ব্যক্তিও শামিল ছিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

অবশেষে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইয়াযিদ বাহিনীর হাতে হযরত হুসাইন (রা.) এর সকল সাথীবর্গ শহীদ হয়ে যান। যাদের মাঝে দশজন যুবক হুসাইন (রা.) এর নিজের ঘরের ছিলেন। এক তীর এসে হুসাইন (রা.) এর কোলের শিশুর গায়ে লাগায় উক্ত কোলের শিশুটিও শাহাদত বরণ করেন।

হুসাইন (রা.) শিশুটির শরীর থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের এবং তাদের মাঝে তুমিই ইনসাফ কর। ওরা আমাদের এজন্য ডেকেছে যে, তারা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু ওরা এখন আমাদের হত্যা করছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

হযরত হুসাইন (রা.) এর এ দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, দুশমনরা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না। গায়ের কাপড় খুলে বেইজ্জত করতে চাইবে। তাই তিনি তাঁবুতে ফিরে গেলেন। বললেন, আমাকে এমন একটা কাপড় দাও, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করবে না। যাতে করে কাপড় খুলে নিলেও কম দামী উক্ত চাদরটি যেন শরীরে রেখে যায়। একদম উলঙ্গ করে না ফেলে। তারপর তিনি একটি পুরাতন চাদর জামার নিচে পরিধান করলেন। তারপর তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইয়াযিদ বাহিনীর সৈন্যরা হযরত হুসাইন (রা.) কে হত্যার সুযোগ পেয়েও করছিল না। এর কারণ হল, তাদের কেউ হুসাইন (রা.) কে হত্যার দায় নিতে চাচ্ছিল না। একজন চাচ্ছিল অন্যজন হত্যা করুক।
অবশেষে শিমার জিলজাওশান সৈন্যদের আহবান করে বলল, তাকে হত্যার ব্যাপারে তোমাদের কিসের অপেক্ষা?
তখন যুরআন বিন শারীক তামীমী হুসাইন (রা.) এর দিকে অগ্রসর হয়ে কাধে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। এরপর সিনান বিন আনাস আমর নাখয়ী তাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে মাথা কেটে ফেলে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩৫২]

হুসাইন (রা.) বীরের মত লড়তে লড়তে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

নিকৃষ্ট খুনীরা হযরতের শরীর থেকে সকল কাপড় খুলে নেয় পুরাতন চাদরটি ছাড়া। শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেলে। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

শিমার হযরত আলী আসগর তথা যাইনুল আবেদীন রহঃ কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন হুমায়দ বিন মুসলিম তাকে তা থেকে নিবৃত করে। কারণ, তখন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন।
এরপর সেনাপতি উমর বিন সা'দ এসে বলল, সবাই শুনে রাখ! কেউ যেন এ মেয়েদের তাঁবুতে প্রবেশ না করে এবং এই বালককে হত্যা না করে। আর যে তাদের কোন সামানপত্র নিয়েছে, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩৫২]

কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন যারাঃ

কারবালা যুদ্ধে আবু তালেবের পরিবারের ১৮ জন ব্যক্তি শহীদ হন।

এর মধ্যে হুসাইন (রা.) এর ভাই ছিলো ৬ জন। তারা হলেন-

১) আব্বাস। ২) জা'ফর। ৩) উবায়দুল্লাহ। ৪) উসমান। ৫) মুহাম্মদ। ৬) আবু বকর।

হুসাইন (রা.) এর ছেলে ছিলো ২ জন। তারা হলেন-

১) আব্দুল্লাহ। ২) আলী আকবর।

হাসান (রা.) এর এর ছেলে ছিলো ৩ জন । তারা হলেন-

১) কাসেম। ২) আবু বকর। ৩) আব্দুল্লাহ।

আকীল বিন আবী তালেব (রা.) (মুসলিম বিন আকীল (রা.) এর ভাই) এর ছেলে ছিলো ৩ জন । তারা হলেন-

১) জা'ফর। ২) আব্দুর রহমান। ৩) আব্দুল্লাহ।

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবী তালেব (রা.) এর ছেলে ছিলো ২ জন । তারা হলেন-

১) আউন। ২) মুহাম্মদ।

আকীল (রা.) এর নাতি ছিলো ২ জন। তারা হলেন -

১) আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম। ২) মুহাম্মদ বিন আবী সাঈদ বিন আকীল।

উমর বিন সাঈদের সৈন্যদের ৮৮ জন নিহত হয়। [তারীখে খলীফা ইবনে খাইয়্যাত-২৩৪-২৩৫, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-১১/৫৫১-৫৫২]

হুসাইন (রা.) এর ছেলে আলী বিন হুসাইন তথা যাইনুল আবেদীন অসুস্থ্য ছিলেন। উমর বিন সা'দ সৈন্যদের বলল, তাকে যেন কিছু না করা হয়। [তারীখুল কাবীর লিইবনে আবী খায়ছামা-২/৯১৪]